একশো বছরের নিঃসঙ্গতা

হিন্দোল ভট্টাচার্য

অ ম ঙ্গ ল কা ব্য

শেষ মুহূর্তের বাঁশি
বেজে উঠছে আমার শরীরে,

শরীর, যা সত্তা নয়
তার চোখ জানে না শিকার

সত্তার ভিতরে গান
রাসলীলার অন্তঃপুর ঘিরে

গেয়ে ওঠে, বেজে যায়
ডম্বরু, আশৈশব তার

এ কেমন বেজে যাওয়া!
এই ভিড়, হৃদয়ের নয়...

সামনে পোড়া ছাঁচ জুড়ে
আমারই জুড়িয়ে - আসা ভয়

লকলক লকলক করছে
শিল্পী, তুমি শাসনে সাজাও

বহুদিন ভেসে আছ
যে-শরীর, আজও ভেসে যাও!

চ ক্র পু রু ষ

শিল্পরত্ন হতে চাই না
নৃত্যরত চক্রপুরুষের

করণ্ডমুকুট পরে
দু-হাতের আকুল প্রণাম

যুদ্ধসাজ, দশভুজ
কীলকের উপরে চক্রের

আদিমহাকাল ঘোরে
ঘোরে মাটি, কৃষিকাজ, গ্রাম

গুনগুন মন্থর ভোর
স্তম্ভশীর্ষে মেঘের পতাকা

দশদিকে তাকায় গাছ
শিকড়ের শাখা ও প্রশাখা

আমার আত্মার পাশে
মনখারাপ, আয়ুধসমূহ

ছায়ার ভিতরে লীন—
অঞ্জলিতে নাম লিখে দিয়ো

২০০৮

বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত

একটা স্কুল উড়ে আসে সুধাময়ের পেছনে - পেছনে
উড়ে আসছে হেডমাস্টার
উড়ে আসছে স্কুল - সেক্রেটারি
উড়ে আসছে জানালা
ওই জানালা দিয়েই উড়ে এসেছিল একদিন সার্কাসের বাঘ, বাঘের ট্রেনার পাম্পু
আর তার প্রেমিকা লায়লা।
দুধের মতন সাদা লায়লার পেট, সেই পেটের ওপর দিয়ে হাতি চলে যায়,
তাই দেখে, দেখে - দেখে হাতির মালিক পেটের গভীর নীচ দিয়ে
চলে যেতে চায় রোজ - রোজ,
সার্কাস মালিকই চালায়। চালায় লরির চাকা রঘু - ড্রাইভার।
সেই কোন সকালে উঠে
রঘুর তিন - চাকা লরির ওপর
জানালা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে সুধাময়
ছোটবেলাকার সেই স্কুলটির খোঁজে
যেইখানে অনুরাধা - দিদিমনি আম ও কুলের আচার বেচত টিফিনে,
মুকন্দ - স্যারের ক্লাসে পড়ানো থামিয়ে দিয়ে ঘুলঘুলি থেকে
পেড়ে আনা হত চড়ুইয়ের ডিম আর
হাড়জিরে ইটের পাঁজর থেকে একে - একে জানলা খসে উড়ে যেত
শালের জঙ্গলে।

২.

হেডমাস্টার আর স্কুল - সেক্রেটারির টাকা যায় স্কুল -ফান্ডে— জানলা নয়,
যাতে ভাঙা -স্কুল সারাইয়ের পর
বাকি টাকা মেয়ের বিয়েতে আর ইন্দিরা বিকাশ।
লরির পেছনে ওই জানালার পাশে জড়াজড়ি করে আজ শুয়ে আছে
পাপ্পু ও লায়লা! জানালা দিয়ে উড়ে যাবে তার মালিকের তাঁবু থেকে
মেদিনীপুর স্টেশন নীচে রেখে চেন্নাইয়ের দু-স্টেশন আগে।

কুশীনগর : শেষ গাথা

কৌশিক মুখোপাধ্যায়

গোধূলি। দেশনা - শেষে সবুজ অরণ্যে তাঁর চিরবস্ত্র বাতাসের স্নেহে উদাসীন। তীব্র রাত জেগে ওঠে দূর গৃধ্রকূটে। উপলব্ধিময় আলো। দশকের - দশকে সঙ্ঘ শিল্পের কথা বলে গেছে। সৃষ্টির কথা। শ্রমণ দূরত্ব বুঝে দ্রুত পায়ে শিবিরের পথে। ওখানে রন্ধনকারী ত্রিমাত্রিক শূন্যবোধ। নির্মাণ-পদ্ধতির আঁচলে মিশিয়ে দেওয়া কোমল অবুঝ রং। সচেতনভাবে; ভগবন? কবে সে-লুম্বিনীতলা আলোকের স্পর্ধা পেয়েছিল? কোন সে-প্রত্নের গানে? ওরা বলে আলেয়া সে-সব! তুমি আজও সন্ধ্যাস্তবে স্থির, অচঞ্চল? হিমেল স্তরের নিচু প্রবচন পাঠ করো মৃদু? বিশ্বাস করি না কোনওদিন। এ-অনন্ত শূন্যতায় ক্লান্তির, হে অবরোহন, জানি, তুমি সুপ্তিহীন আজও। অমোঘ মৃত্যুর চোখে তুলিজীবনের লিপিগুলি। জাগাও, জাগাও ভগবান।
সঙ্গে আমি নিদ্রাহীন নিরুপায় তৃষিত শ্রমণ...

সানাই

সুমন ঘোষ

নিয়মিত - ভিজে - যাওয়া কান্নার সানাই
যেতে - আসতে ঝেড়ে - ফেলা মোরামের লাল
পাঠের আসর তুলে তরুণ - মাস্টার
পঞ্চায়েত ঘরে গার্হস্থ্য - সংগ্রাম দেখে।
মাথায় - মাথায় যুদ্ধ, সমূহ কোন্দল
হিসেবনিকেশ - কষা সন্ন্যাসী আঙুল
নিখুঁত গণনা ছিল অঙ্কের খাতায়
অতর্কিত তবু
সুড়ঙ্গে
সংখ্যার
খেলা
খেলতে
খেলতে
নিরুদ্দেশ...
কত কত বিপিএল লোক - সমাবেশ
কৃত্রিম কুয়াশা - পাশে ছিঁড়ে - যাওয়া তার
দশটায় গরম ভাত... পঞ্চায়েত...তরুণ- মাস্টার

মাধবীর জন্য

প্ল্যাবন ভৌমিক

আমাদের মাধবীর হঠাৎ বয়স বেড়ে গেছে।
ঘাড়ে বা গলায় ম্লান শিকড়ের দূর কোলাহল।
ফুঁ দিয়ে ফেলেছি, জানি আমারও উপায় কিছু নেই।
আপাতত চোখ বন্ধ করে রাখি, ক্ষুরধার ত্বক।
অথচ যখন আমি আঙ্গিকের প্রতিপক্ষ খুঁজি,
রোজই দেখি ভূতগ্রস্ত মাধবীর মুখোমুখি আমি।
সে-ও তো আমারই মতো আগন্তুক এবং প্রাক্তন।
চোখ বন্ধ করে রাখি। আমি তার ক্রুদ্ধ সমর্থক।

অলক্ষ্মীর পাঁচালি

চৈতালী চট্টোপাধ্যায়

আমি আগে - আগে যাই,
(মেয়েরা ইউজুয়ালি যায় না)
আমি ইতিউতি চাই,
আমার খুন্তি - হাতা সয় না।

'আমি মা', এ সত্য তো শারীরিক,
ফলত আলাদা কিছু মানসিক
চাপ নিতে হবে বুকে, মানি না।
লজ্জার সীতাহারে সাজি না।

আমি আড়মোড়া ভাঙি আকাশে,
শিস দিয়ে ফুল তুলি বাতাসে
চোখে অন্যের রং পরি না।
শরীর না যদি চায়, ঝরি না!

একদা পুরুষ সব জানত,
রাজপথ, গলি না অনন্ত,
বলে দিত, বোকা - বোকা হাসতাম।
এখন নিজেই ছুঁই স্পেকট্রাম।

কন্যারা, যেন কেউ ভুলো না—
এই প্রজন্ম, তোর জন্য
ডায়েরি লিখছি। শোনো, কখনও
আমার নির্জনতা ছিল না।

নামগান

মন্দিরে রাখিনি, আর
রক্তমাখা জামাকপড়ের স্তূপে, স্থাপন করেছি বিগ্রহ।
আধমরা হাহাকারগুলি, তোমার উদ্দেশে ঘন্টাধ্বনি।
যে-সার্চলাইট আজ ছিন্নভিন্ন হাত - পা খুঁজছে, পঞ্চপ্রদীপ ওইটেই।
সন্ধ্যারতিও ধরে নিতে পার।
ভয়ার্ত কাঁপা অন্ধকার, কিনে - আনা চাঁদমালা আমার।
ভাঙা স্যুটকেসে বসে - বসে
তোমায় মুরলী শুনছি, কী শান্ত,
কিন্তু, কেন যে বারবার চোখে ক্রোধ আসে

শালপাতায় মুড়ে

অনাময় কালিন্দী

১.
চাপা চাপা রক্ত মেখে দাঁড়িয়ে আছে আমড়ুখেত। কুয়াশার নীচে লাল - রঙে
এত বিপন্নতা! শূন্য জমিতে খচখচ করছে ধানগাছের নাড়াগুলি। বহুযুগের ওপার
থেকে হু - হু হাওয়া, তোমার কাতর যন্ত্রণা।

এই তো তমালগাছ মুখ কালো করে। নাওয়া নেই, খাওয়া নেই। একটা - দুটো করে
ঝরিয়ে দিচ্ছে পাতা। ঢেঁকিতে চিঁড়ে কোটার শব্দ - গন্ধ - শুশ্রূষা থেকে কত দূরে!

কী আর করতে পারি বলো ফেলে - দেওয়া দেশলাই - বাক্সের মতো হিমে ভেজা
ছাড়া? অস্পর্শসম্ভব মাটির ওপরে কার চোখের জল আটকে থাকে
মাকড়সার জালে, নিরন্তর?

লাহি - লাগা শিমফুলে তবু প্রাণ। খড়ের তৈরি বড় - সাপের মতো
শুয়ে তাকে গাঁয়ের কুল্‌হিতে। পাকে - পাকে জরাবে স্বপ্নবীজ দীর্ঘ শীতগুমে

২.
চাড়াপ - চুড়ুপ খরগোশ লাফায় বনে। কালো - চুলে কুড়চিফুলের গোছা যেন।
তুলতুলে মাংসের কোন গভীর থেকে উঠে আসে আলোর নাচন?

গাঢ়া থেকে সিহড়িগাজাড়। কেঁদগাছের গোড়া থেকে মহুলতল।
এটুকুই সীমা। এর বাইরে গভীর শালগাছের অদৃশ্য শাসন।

ঝর্ণার জল বিস্বাদ লাগে। কচি ঘাসও মুখে রোচে না তার। থরথর কাঁপে—
ওই বুঝি কেউ এল— আলোর শেষ বিন্দুটিও শুষে নেয় মাংসের আধাঁর—
এ-ভাবেই মুড়োয় নটে গাছ।

সঁয়ালাটা তুচ্ছ করে খরগোশ লাফাবে কোনওদিন পুরনো চাঁদের দিকে পুনর্বার?

কটাক্ষ

সুমিতাভ ঘোষাল

এই-যে বউকে লুকিয়ে এত ঝুপঝাপ
মাঝে-মাঝে অফিসের ট্যুর
এই-যে সন্তানের ছবি রাখছ মোবাইল - স্ক্রিনে
এই-যে দগ্ধ - প্রাণ মেলে ধরছ
বৃষ্টিতে ভেজার আগে টেনে ধরছ নিজের কলার
হ্যাং-ওভার আর অভিমান গুলিয়ে ফেলছ
দু-মুখো সাপের মতো হেঁটে যাচ্ছ
অথচ পৌঁছতে পারছ না কোত্থাও
এই-যে সম্পর্কের গায়ে তুমি দাঁত ফোটাতে পারছ না
ভালবাসা আর বউ—দু-জনের কাছেই গালি খাচ্ছ
যে-কোনও একজনকে ছেড়ে দেওয়ার স্বপ্ন দেখছ রোজ
তা কি শুধু এইজন্য—
কলঙ্ক তোমার কাছে ডিভোর্সের চাঁদ হয়ে আছে!

প্রলাপ

চিরঞ্জীব বসু

এই ভাব কামভাব, এই ভাব রূপের অধীন
রূপের শৃঙ্খল যেন এই ভাব আমাকে রেখেছে
মানুষের থেকে বেশি, অধিক বয়স্ক করে, দূরে
তারতম্য জেনে গেছি, একা এক প্ল্যাটফর্মে একাই হেসেছি
এইভাবে বিজ্ঞাপন, কমিক - রিলিফ হয়ে জীবনের রেস্তোরাঁয়, আহা
এইভাবে এসেছিল যে - ভাবে আহার আসে কুকুরের কাছে...

এ-পরবাসে

অঞ্জলি দাশ

বৃষ্টি লিখে শুকনো পাতা উড়িয়ে দিয়েছি,
তাই বলে তোমাকেও চলে যেতে হবে অন্যদেশে।

চিরহরিতের পাশে বোবা - তাঁত, অন্য - এক টানাপোড়েনের
স্বপ্নে যেখানে রঙের পাত্রে অক্ষর ভেজায়,
সেইখানে রেখেছ চৌচির শ্লেট,
সেইখানে খুঁজে দেখছ ছেঁড়া পাতাদের গায়ে
অন্য - কারও নাম লেখা ছিল কি না।

আবার ফিরতে ইচ্ছে করে?

তবু অন্যমনে ঘর এঁকেছি বলেই ভেবে না আসতে হবে,
এ আমার মুদ্রাদোষ।
এ-রকম কতবার চৌখোপ এঁকেছি,
মুছে ফেলে ফের অন্যভাবে, ত্রিকোণ, পাঁচকোণ,
সাতসমুদ্রের স্বপ্নে অন্ত্যমিলহীন ঘেরাটোপ,
এ-সব তো বন্ধনের ফন্দিফিকির,
নানা ছাঁদে ছাদহীন আকাশকুসুম।

খিদে

ভাতঘুম ভেঙে গেলে বুঝি, অন্নকষ্ট লেগে আছে চোখে।
যতদূর অনায়াস যাওয়া,
সেটুকুই শান্ত রাখে সম্পর্কের মাঝের শূন্যতা,
হা-হুতাশ
তারপর পথ শুধু প্রলোভনে পিছনেই টানে।

বন্ধ - চোখে টের পাই
অন্ধকার, নিশ্বাসের দ্রুত ওঠানামা, আরও দূরে শূন্য বাড়িতে খিদে,
অকপট দাঁতের জিভের গল্পে ভরপুর।
বুকে - পিঠে আলো ফেলে চারপাশে পরিত্যক্ত শালপাতা ওড়ে
শধু শান্ত, সবুজ, একা কলাপাতাটির গায়ে একদানা নুন দেখে
চারাপাশে সহসা ঘনিয়ে হাসে হাহাকার,
ঘুরেফিরে সেইখানে দু-চোখ জড়ায় ফের,
একপলকের ওম।
আদি - তৃণটির - বুকে - জমে - ওঠা দুধ থেকে
জীবনের গন্ধ ভেসে আসে।

শোভাবাজারের গলি

শাশ্বত গঙ্গোপাধ্যায়

জানালার শিক ঘিরে ছুটে আসে ঋতুময়ী হাওয়া
ভিটেবাড়ি ভেঙে গেছে, আয়নার পারাহীন কাচে
কবেকার - আটকানো লালটিপ, বাসি লেবুগুলো
মাটিতে গড়িয়ে যায়, ফাটামেঝে রস শুষে নেয়

শরীর রয়েছে পড়ে, তাতে জমা হয় মৃদু শীত
রাত হলে লুডো - খেলা, সাপ - সিঁড়ি, লাউড স্পিকারে
মনের মতন গান ফেটে পড়ে, ঘুমে ভেসে যায়
ফুটোকাঁথা পাশ ফেরে, যেন ডায়েরির কোনও পাতা...

সিঁড়ি বেয়ে ধাপে - ধাপে উঠে আসে শীর্ণকায় চাঁদ
মাঝরাতে বারান্দায় ন্যাংটো বালক হিসি করে
তাকে ছুঁয়ে শব্দহীন পরিটির নীল স্নেহ
হিম হয়ে ঝড়ে পড়ে, জেগে ওঠে চির - উপকথা

মাতৃভূমি বাম্পার - সিরিজ

যশোধরা রায় চৌধুরী

১.
যা-কিছু ছিল উৎসাহ আর
যা-কিছু ছিল আশা
পুঁটলি বেঁধে সঙ্গে নিলে, বাকি যা, পড়ে রইল ঘরে, ফাঁকা

সে - সব অতি - কাপড়, অতি - বিনষ্টিময়
সে-সব অতি-নশ্বরতার, আমূল গুছি
ফাঁপানো চুল, বালিশ, ওয়াড়, মিলনমেলা পত্রিকাটির তিনটি ইস্যু

যা-কিছু ছিল আরামপ্রদ
যা-কিছু ছিল রৌদ্রে - দেওয়া
আমার ভাগ না - রেখে তুমি সমস্তটা কাচিয়ে গেলে
সঙ্গে নিলে
আঁকড়ে গেলে দূরে

কেন-যে কিছু রাখোনি ফেলে, তেমন করে নেবার মতন, প্রাণবন্ত

যা - কিছু ছিল এনার্জি আর ব্যঞ্জনাময়
গলার স্বর, যা-কিছু ছিল বাঁচা
বোঁচকা বেঁধে সঙ্গে নিলে, নিয়ে দিদার বাড়িই গেলে নাকি?

আমায় ফেলে এ-ভাবে কোনওদিন তো তুমি যেতে না, ফেলে খাঁচা

পদাবলি

গৌতম ঘোষদস্তিদার

চিরকাল মধ্যদুপুরে তুমি নিজেই খুলে দিয়েছ গুপ্তকক্ষের দরজা
আমি মরুভূমি আর কাঁটাঝোপ অবিশ্বাস আর সন্দেহ পেরিয়ে
সতর্ক প্রতিহারীর চোখে ধুলো দিয়ে নিখুঁত আঙুলে তোমার সিঁড়ির বাঁকে
ইঙ্গিত বাজিয়ে দিতেই বারবার নিজের হাতে দরজা খুলেছ সন্তর্পণে
আর আমি তারপর রীতিমতো দরজা বন্ধ করেছি পরদা টেনেছি জানলার
আর ক্রমে খুলে দিয়েছি তোমার নিজস্ব আড়াল আর প্রবেশ করেছি চন্দ্রালোকে
তোমার নূপুর - বিনা আর - কিছু অবশিষ্ট রাখিনি আমি কোনদিন
তুমিও অক্লেশে আমাকে নিয়ে গেছ একেবারে গভীর খাদের কিনারে
আর নিঃশেষে প্রপাত ঢেলে দিয়েছ আমার অনন্ত পিপাসায়
গান আর গায়ত্রী হয়ে আমাকে নিয়েছ নিজের অতলে
অবশেষে রহস্যমোচনের পর তুমি খঞ্জনী তুলে নিয়েছ হাতে
আর আমি তোমার নির্জন আখড়ায় বসে নতুন পদ বেঁধেছি...

আজ কণ্ঠী ছিঁড়ে গেছে, হারিয়েছে ভাষা, খসে গেছে স্মৃতির নূপুর
আমি আজ অন্ধ ভিখারির মতো প্রতিদান খুঁজি এ-গাঁয়ে সে - গাঁয়ে
মেলা থেকে অন্য - মেলা গান মাধুকরী করি আর আচঁলা ভরে ওঠে
তোমাদের - ফেলে - দেওয়া সারিগানে আর তাতে ঢেউ এসে লাগে অবিরাম
গান মূর্ছা যায় মুছে যায় তোমাদের চোখের সামনে আর আমি চোখ বুজে ফেলি
নতুন গানের তীরে নৌকো এসে লাগে আর তুমি উড়ে যাও মেঘের আড়ালে...

সাইবার - যুগ

পিনাকী ঠাকুর

শহর যখন পালটে যায় কংক্রিটের অরণ্যে, বর্ডার পেরিয়ে
তিনজন আতঙ্গবাদী বাড়ি ভাড়া নেয় গলির প্যাঁচের ভেতর,
ওড়াতে থাকে নোটের - পর নোট। কুকুর দিয়ে গন্ধ শোঁকায়
স্পেশাল পুলিশ। কেউ কোত্থাও নেই

পাড়ার দোকান উপড়ে দিয়ে শপিং - মল, ময়বার দোকানের
জায়গায় তমুকরাম ভুজিয়াবালা। 'লেটার - প্রেস' বলে কিছু হয় না
আর। চারদিকে ম্যাসাজ - পার্লার আর হেল্‌থ - শপ। একতলা
দোতলা পুরনো সব বাড়ি জরিপ করে যায় প্রোমোটারের
মুন্‌সিরা। ধার আদায় করতে গুণ্ডা পাঠায় বেসরকারি ব্যাংক

যখন শিঞ্জাড়াকে 'সামোসা' বলতে শেখে ঠাসা - মারুতিভ্যানে-
ঘামতে - থাকা টাই - পরা বাচ্চারা। দর করে গোলাপ কিনতে
যায় তিনজন কিশোরী। শহরে সাইবার - যুগ আসে
পাড়ার মোড়ে শহিদবেদী দাঁড়িয়ে আছে তখনও।
একটা - দুটো দেশি গাঁদা আর অপরাজিতা শিশিরে ভেজে
শহিদবেদির মাথায়

সন্ত্রাস

শঙ্খ ঘোষ

আট বছরের শিশু মৃত্যভয় জপে সারাদিন
এতটুকু শিরোদেশে জমিয়ে তুলেছে শিরোভার।
যে-কোনও শব্দেই কাঁপে, কেঁপে উঠে আঁকড়ে ধরে মাকে—
'ভেঙে যদি পড়ে সব? যাবে না কোথাও তুমি আর।'
স্বপ্নের ভিতরে ঘোরে শবেরক্তে মাখামাখি ছবি
কেবলই আগুন দেখে, পাখিরও শোনে না কোনও শিস
অবোধ অজ্ঞানে তার চার বছরের বোন বলে:
'ওভাবে বলছিস কেন? এখনও তো বেঁচেই আছিস!'

শেষ বিকেলের লেখা

সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়

১.

বিস্বাদ, বিলোপপ্রিয় ঘাড়ে চেপে বসেছ আবার
বুকের ওপর বসে রক্ত খাচ্ছ ভলকে - ভলকে
স্বাদহীন বিকেলের ফুলে - ফেঁপে ওঠা প্রাণিলোকে
খুঁজে ফিরছ চেনা রাস্তা, চেনা মোড় ফেরত যাবার

বিস্বাদ, ফেরা কী ভাল আলজিভ - বরাবর ধরে
দাঁতে - পেসা, লালায় - ভেজানো উত্তেজিত অন্ন - রূপে
বমনে বিস্তৃত হয়ে স্নায়ুধার্য স্মৃতি - রান্না - স্তূপে
জেগে - থাকা কবিমতো ফিরে - যাওয়া রচনার জ্বরে

বিস্বাদ, বিদেশবার্তা, না-লেখার চোরা উপশম
আবার হঠাৎ এসে বেড় দিয়ে ধরেছ আমাকে
জ্বালা দিয়ে ফুটিয়ে তুলছ স্বাদহীনতার পুঞ্জফেনা
আমিও মধুর থেকে ক্রমে ফিরে পাচ্ছি কটুতাকে
ভুলে যাচ্ছি কটুকেও, যাতে জিভ কিছুই চিনবে না।

ও বিস্বাদ, পেরোচ্ছি রচনাস্মৃতি না - লেখার ঊনকোটি ক্রম

সব উড়ে যায়

গৌরশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

উড়ে যায় সব কিছু উড়ে যায়
উড়ন্ত ডানার পাশে শব্দহীন মেঘ
নির্ভর শরীরে
সারারাত যাতায়াত করে।

তোমার ঘড়িতে এখন কটা বাজে
দুপুরে যে - হলে সিনেমা দেখতে চাও
সেখানে চলছে আজ রব নে বানা দে জোড়ি
অসম্ভব জোরে ছুটছে অটো
অপেক্ষার সেলসিয়াসে চড়ছে পারদ
দুপুরের রোদে কোন
অপেক্ষার গজল শুনবে
বাতাস উঠছে
ঘুড়িও উড়ছে
সময় ঘড়ির মধ্যে গড়িয়ে যায়
কাকে আজ ডেকেছি ভোজসভায়

প্রেমে

সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ঘুমোনোর সময় আমি হৃদপিণ্ডকে
বের করে আনি, বালিশের পাশে রাখি
যেখানে মোবাইল থাকে

আমি ঘুমোই
তুমি ভাবো আমিই এসএমএস পাঠাই
রাতভর!

প্রশান্তি

ঝোলা কাঁধে হেঁটে যান আজনবি
কঠিন ভূপৃষ্ঠে
অপরাজেয় তার ছায়া
দোলনহীন তার ঘড়ি
ব্যথাকে তিনি দিয়েছেন উদ্যানরক্ষকের পদ